# কন্যা শিশুর শিক্ষা

সেলিনা আক্তার

'তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' নেপোলিয়নের এই উক্তি কতটা যুক্তিযুক্ত তা প্রমাণিত। বিশ্ব এ উক্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই বর্তমানে কন্যা শিশুর শিক্ষার হার বেড়েছে। বাংলাদেশেও কন্যা শিশুর শিক্ষার হার বেড়েছে। পূর্বে কন্যা শিশুর শিক্ষা গ্রহণকে অলাভজনকভাবে দেখা হতো। মেয়েদের লেখাপড়া করাতে খরচ হবে, বিয়ে দেওয়ারও খরচ আছে - এসবের জন্য পূর্বে কন্যা শিশুর শিক্ষার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য কালক্রমে এ ধারণা পাল্টেছে। কারণ, আজকের কন্যা শিশু আগামী দিনের নারী। তাই, প্রতিটি কন্যা শিশুর শিক্ষা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। কারণ, কন্যা শিশু শিক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারলে সরকারের এসডিজি- ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। তাছাড়া সরকারের রূপকল্প- ২০৪১ বাস্তবায়িত হবে যার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কারণ, যেকোনো কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নারী পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য। কন্যা শিশুরা হলো সর্বোত্তম বিনিয়োগ ও সমাজের আলোকবর্তিকা। কারণ, তাদের মধ্য থেকেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুঁজে পাই। কন্যা শিশুদের জন্য যদি ভালো বিনিয়োগ করা যায়, তবে সে-ই একদিন বড়ো হয়ে আদর্শ মায়ে পরিণত হয়। আর একজন মা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নানাভাবে আলোকিত করে তুলতে পারে। তাই, কন্যা শিশুর শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে - 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা - যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হইবে।' সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও স্বদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এছাড়াও সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।'

সংবিধানের আলোকে কন্যা শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার কন্যা শিশুর শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। কারণ, শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যা শিশুর সার্বিক উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্ল্যান বাংলাদেশের এক যৌথ জরিপ মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করা ২৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে। নিরক্ষর নারীদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৮৬ শতাংশ। তাই, কন্যা শিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য সরকার নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান অন্তরায়। ছেলে সন্তান পরিবারকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করবে, বৃদ্ধ বয়সে বাবা - মার দেখাশোনা করবে, এবং বংশ পরিচয় বাঁচিয়ে রাখবে। অন্যদিকে মেয়েরা বিয়ের পর পরের বাড়ি চলে যাবে এবং তার সাথে বাবা - মাকে মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুকের বোঝা বহন করতে হবে। তাছাড়া, ধর্ষণ, ইভটিজিংসহ সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে বাবা-মা চিন্তা মুক্ত হতে চান।

সরকারের প্রণীত- শিশুআইন, শিশুশ্রম নিরসন আইন, জাতীয় শিশুনীতি - ২০১১, শিক্ষানীতি - ২০১০, স্বাস্থ্যনীতি, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন - ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন - ২০১৮, ইত্যাদি কন্যা শিশুর শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও, সরকার বিনামূল্যে বই প্রদান, উপবৃত্তি, মিডডে - মিল, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ - ২০২৫ প্রণয়ন করেছে। সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯ হটলাইন সেবাও চালু করেছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অভ স্ট্যাটিস্টিকস (বিবিএস) এর এক জরিপে বলা হয় ২০০৬ সালে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৭৪ শতাংশ, ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের জন্য কন্যা শিশুর শিক্ষাকে এখন লাভজনকভাবে দেখা হয়। এজন্য দেশে কন্যা শিশুর শিক্ষার হার বাড়ছে। কন্যা শিশুর শিক্ষার হার এখন ক্রমবর্ধমান অবস্থায় থাকলেও এটা যে কোনো সময় পূর্বের অবস্থায় ফিরতে পারে কারণ, কন্যা শিশু শিক্ষার হার বাড়ার সাথে সাথে সৃষ্টি হচ্ছে কিছু সমস্যা। যেগুলোর সমাধানে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কন্যা শিশুর শিক্ষার হার এর চিত্র যেকোনো সময় পাল্টে যেতে পারে।

মিতা একজন উচ্চশিক্ষিত নারী। একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করতেন। তার সন্তান জন্ম নেওয়ার পর তাকে চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। কারণ, তার কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। তানিয়া স্নাতকোত্তর পাশ করার পর কোনো চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। এজন্য তাকে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা কটু কথা শুনতে হয়। এসব কথা শুনতে শুনতে একসময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে সে আত্মহত্যা করে। সুমনা একজন সরকারি চাকরিজীবী। অনেক পরিশ্রম করে কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু, বিয়ের পর সংসার বাঁচাতে সেই চাকরিটা তাকে ছাড়তে হয়। কারণ, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির নির্দেশ ছিল তাকে

সংসার অথবা চাকরি থেকে যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করে তাকে সংসারকেই প্রাধান্য দিতে হয়েছে। নারীর নিরাপত্তাহীনতা এর জন্য দায়ী। কারণ, নারী চাকরি করলেও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে নারীর পক্ষে একা বাস করা অসম্ভব। এসব প্রেক্ষাপটে মানুষের মধ্যে আবার একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। অনেকেই এখন পূর্বের ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে। উচ্চশিক্ষিত একজন নারীকে যদি সংসার সামলানো ও সন্তান লালন পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মনে প্রশ্ন জাগে- এত পড়াশোনা করে লাভ কী- যদি তা কাজেই লাগাতে না পারি? কারণ, একজন অশিক্ষিত নারীও তো সুন্দরভাবে সংসার সামলাতে ও সন্তান লালন-পালন করতে পারে। তার ওপর যে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ছে, সেই প্রভাব অচিরেই তার কন্যা সন্তানের ওপর পড়বে। তার কন্যার শিক্ষার প্রতি সে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে পারে।

বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য চাকরি হয়ে পড়েছে অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চাকরি নয়। এটা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মানবিক গুণাবলী বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। সেখানে লিঙ্গভিত্তিক বিবেচনা করা উচিত নয়। একজন উচ্চশিক্ষিত নারী চাকরি না করলে তা সমাজে অসম্মানজনকভাবে উপস্থাপন ও কটু দৃষ্টিতে দেখা উচিত না। শিক্ষা সবার জন্য প্রয়োজন, চাকরি নয়। কিন্তু অনেকের প্রয়োজন না থাকার পরও তাদের বাধ্য হয়ে চাকরি করতে হচ্ছে। আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকার পরও শুধু কটুকথা ও অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা চাকরি করেন। এতে করে কর্মসংস্থানের ওপরও চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। যাদের প্রয়োজন নেই, তারা যদি চাকরি না করেন, তবে যাদের চাকরি নিতান্তই প্রয়োজন তাদের জন্য সহজেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। তাছাড়া, কর্মসংস্থানকে শিশুবান্ধব করতে হবে। সরকারি- বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে। যেন, শিশুরা নারী কর্মক্ষেত্রের বাধার কারণ না হয়। কারণ, আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত। তাই শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা রেখেই নারীর কর্মপরিবেশ তৈরি করা উচিত।

এছাড়া, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা উচিত। শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যেন চাকরি পাওয়া না হয়। সে বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। যেন নারীকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে না হয়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, সমাজ থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়ে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। কারণ, কন্যা শিশু ও নারীকে অবজ্ঞা, বঞ্চনা ও বৈষম্যের মধ্যে রেখে কখনোই একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ দেশ গড়ে উঠতে পারে না। এই বাস্তবতায় নারী ও কন্যা শিশুর বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। সেটা শুরু করতে হবে কন্যা শিশুর জন্য সর্বোচ্চ বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্য সমসুযোগ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আজকের কন্যা শিশু আগামী দিনের একজন সুশিক্ষিত মহিয়সী নারী ও আদর্শ মা এবং সেই আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলোকিত করবে।

#

০৬.০৪.২০২২ পিআইডি ফিচার